International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 134-147
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.205

জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসনঃ ভারতীয় সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপের একটি অধ্যয়ন

আসিফ সরদার
গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Climate change is increasingly shaping patterns of human mobility, especially in environmentally vulnerable coastal regions. The Sundarbans delta, shared by India and Banglade sh, is widely recognised as one of the areas most exposed to climate-related risks. In recent decades, environmental changes such as coastal erosion, salinity intrusion, and frequent cyclones have significantly affected the livelihoods of local communities. These changes often push people to search for alternative sources of income outside their native region. Against this background, the present study investigates the relationship between climate change, livelihood insecurity, and migration in Mousuni Island of the Indian Sundarbans. It particularly focuses on identifying the environmental and socio-economic factors that influence migration decisions and examining the socio-economic profile of migrant households.

The analysis draws on both primary and secondary sources. Primary data were obtained through a field survey conducted among 50 migrant respondents from Baliara village in Mousuni Island using a structured questionnaire. Secondary information was collected from relevant academic literature, reports, and official documents. The findings indicate that declining livelihood opportunities in agriculture, fishing, and forest-based activities are closely linked to environmental change. As a result, many households increasingly depend on temporary or seasonal migration to states such as Kerala and Gujarat as a coping strategy.

Keywords: Climate Change; Migration; Livelihood Vulnerability; Indian Sundarban; Mousuni Island

ভূমিকা:

মানব সভ্যতার ইতিহাসে জলবায়ু ও মানুষের স্থানান্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় যে পরিবেশগত পরিবর্তন বহু ক্ষেত্রেই মানুষের বসতি পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করেছে। Atlas of Environmental Migration-এর তথ্য অনুযায়ী প্রাগৈতিহাসিক যুগেও পরিবেশগত পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে আধুনিক যুগে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারজনিত মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন এই প্রক্রিয়াকে আরও তীব্র করেছে। ভূমি ব্যবহারের অনিয়ন্ত্রণ, বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়, পানীয় জলের সংকট এবং কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস মানুষের জীবিকা ও বসবাসের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। এর ফলে বহু মানুষ জীবিকার অনিশ্চয়তার কারণে নিজ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র অভিবাসনে বাধ্য হচ্ছে (সরকার, ২০২২)। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এই অভিবাসন বর্তমান সময়ে মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিগত কয়েক বছরে ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় খরা সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে। যার কারণে বহু অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকায় প্রভাব পড়েছে। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসন(Migration) খুবই পরিচিত শব্দ। ২০৫০ সাল নাগাদ সারাবিশ্বে কুড়ি কোটি (২০০ মিলিয়ন) মানুষ জলবায়ুগত কারণে অভিবাসন করবেন (Guha & Chandan Roy, 2016)। এছাড়া ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতে ৪.৫ কোটি মানুষ পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে অন্তর্বর্তী অভিবাসন করবেন(study conducted by International agencies action aid international এবং climate action network south asia)। ভারত ও বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বিপদজনক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে IPCC এর রিপোর্টে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগস্থলে বিশ্বের সবথেকে বড় ব-দ্বীপ অঞ্চল সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরবনের প্রায় ৬০% বাংলাদেশ এবং ৪০% ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমানে ৯৮ টি দ্বীপ রয়েছে আগে ১০২ টি দ্বীপ ছিল, এই ৯৮ টির মধ্যে ৫৪ টি তে মানুষ বসবাস করে। 2002 সালে, ডঃ হাজরা অনুমান করেছিলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে 2020 সালের মধ্যে সুন্দরবন থেকে 69,000 জনেরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হতে পারে। 2018 সালে, প্রায় 60,000 মানুষ ইতিমধ্যে এই অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রতি বছর এই অঞ্চলের ঝুঁকি বাড়ছে। এই অঞ্চলের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নিম্ন আয়ের পরিবারের এবং তাই তারা পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

যদিও সুন্দরবন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসন নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে, তবুও নির্দিষ্ট দ্বীপকে কেন্দ্র করে পরিচালিত ক্ষেত্রসমীক্ষা তুলনামূলকভাবে খুব বেশি দেখা যায় না। বিশেষত মৌসুনি দ্বীপের মতো ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশগত পরিবর্তন মানুষের জীবিকা ও বসবাসের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণায় সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপকে ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানুষের অভিবাসনের কারণ এবং অভিবাসীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

১. মৌসুনি দ্বীপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানুষের অভিবাসনের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে এমন পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক কারণগুলি চিহ্নিত করা।

২. মৌসুনি দ্বীপ থেকে অভিবাসন করা মানুষের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং তারা কোন কোন কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হয় তা বিশ্লেষণ করা।

গবেষণার প্রশ্ন:

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৌসুনি দ্বীপে মানুষের অভিবাসনের সিদ্ধান্তকে কোন কোন কারণ প্রভাবিত করে?

২. মৌসুনি দ্বীপ থেকে অভিবাসন করা মানুষের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য কী এবং তারা কোন কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হয়?

গবেষণা এলাকা:

এই গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষা হিসেবে সুন্দরবন অঞ্চলের মৌসুনি দ্বীপকে নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বীপটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত একটি উপকূলীয় অঞ্চল। মৌসুনি দ্বীপ মূলত চারটি গ্রাম যথা মৌসুনি, বাগডাঙ্গা, কুসুমতলা এবং বালিয়ারা নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী

এই দ্বীপের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২২,০৭৩ জন। ভৌগোলিক দিক থেকে দ্বীপটির মোট আয়তন প্রায় ২৭.১ বর্গ কিলোমিটার।

গবেষণার পদ্ধতি:

এই গবেষণায় মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি (Mixed Method) গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাথমিক ও গৌণ উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মৌসুনি দ্বীপের বালিয়ারা গ্রামে ৫০ জন অভিবাসীর উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সুগঠিত প্রশ্নমালা (structured questionnaire) ব্যবহার করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তরদাতাদের নির্বাচন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গৌণ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বই, গবেষণা প্রবন্ধ, সরকারি প্রতিবেদন এবং সুন্দরবন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি ব্যবহার করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত অভিবাসনঃ ধারণা ও বিতর্ক

সাম্প্রতিক দশকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা এবং তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Internal Displacement Monitoring Centre–IDMC)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৩.৭ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে (*2022 Global Report on Internal Displacement,* 2022)। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপপ্রবাহ, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো বিপর্যয়ের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (International Organization for Migration–IOM) অনুমান করেছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ২৫ মিলিয়ন থেকে ১ বিলিয়ন মানুষ পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হতে পারে (International Organization for Migration, 2008)। দক্ষিণ এশিয়াও এই প্রবণতার বাইরে নয়; বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে প্রতিবছর এই অঞ্চলে বিপর্যয়জনিত কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া (CANSA)-এর মতে ২০৫০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ভারতেই প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে স্থানান্তরে বাধ্য হতে পারে (Garg et al., 2021)। এই পরিস্থিতি জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসনের পারস্পরিক সম্পর্ককে বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন নিয়ে আলোচনা বাড়লেও 'জলবায়ু অভিবাসী' বা 'পরিবেশ উদ্বাস্তু' শব্দগুলির একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন গবেষক ও সংস্থা এই ধরনের বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে 'Environmental refugee', 'Climate refugee' অথবা 'Environmental migrant' নামে অভিহিত করেছেন (SEN & BASU RAY CHAUDHURY, 2023)। তবে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর মধ্যে এই শব্দগুলির ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কারণ পরিবেশগত কারণে স্থানচ্যুত ব্যক্তিরা ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের আইনি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই প্রসঙ্গে গবেষকদের মধ্যে দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ— 'Maximalist' এবং 'Minimalist'। Maximalist দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন অভিবাসনের একটি প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করে এবং ভবিষ্যতে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারে। অন্যদিকে Minimalist দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে যে অভিবাসনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত কারণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিবাসনের সিদ্ধান্ত একাধিক কারণের সম্মিলিত প্রভাবের ফল।

পরিবেশগত অভিবাসনের একটি কার্যোপযোগী সংজ্ঞা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (International Organization for Migration–IOM) প্রদান করেছে। IOM-এর মতে, পরিবেশগত অভিবাসী হল সেই ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী যারা পরিবেশের আকস্মিক বা ধীরগতির পরিবর্তনের ফলে তাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজ বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, অথবা অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ধরনের স্থানান্তর দেশের অভ্যন্তরে কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মাইগ্রেন্টদের নামকরণ নিয়ে মতান্তর রয়েছে; পত্র পত্রিকায় এদের 'Climate change refugee', 'Environmental refugee' ইত্যাদি নামে অভিহিত করলেও আন্তর্জাতিক আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সাধারণ 'উদ্বাস্তু বা শরণার্থী(refugee)' থেকে আলাদা। লেস্টারব্রাউন প্রথম 'Environmental refugee' শব্দবন্ধ ব্যাবহার করেন, পরবর্তীতে 'Climate refugee', 'Climate change refugee', Environmentally displaced person (EDP), 'Disaster refugee', 'Environmental displace', 'Eco-refugee', 'Ecologically displaced person', 'Environmental-refugee-to-be(ERTB)' ইত্যাদি নানা নামে পরিবেশ- উদ্বাস্তুদের অভিহিত করা হয়। বাস্তব অর্থে, এদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই (সরকার, 2022)। পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে হওয়া শরণার্থী বা অভিবাসন নিয়ে আলোচনায় যার নাম প্রথমেই আসবে তিনি হলেন ম্যাক্সিমালিস্ট স্কুলের নর্মান মেয়ার্স, তার মতে পরিবেশ উদ্বাস্তু সংখ্যা সারা পৃথিবীর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত উদ্বাস্তুর সবচেয়ে বড় অংশ হয়ে উঠবে, ২০৫০ সালের এই সংখ্যা দাঁড়াবে ২০০ মিলিয়ন। জলের অভাব, কৃষি জমি লবণাক্ত হয়ে ওঠা, জীব বৈচিত্রের ক্রমহাসমান অবস্থা ইত্যাদিকেও তিনি এই ধরনের বাস্তুচ্যুতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন (সরকার, 2022)

জলবায়ু অভিবাসনের কারণ:

সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি:

প্রথমত, পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুতির বা মাইগ্রেশনের একটি বড় অবদানকারী হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। যদিও গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে সাধারণত বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাকে বোঝায়, ক্রমবর্ধমান সমুদ্রের তাপমাত্রা এই অঞ্চলের জন্য বিধ্বংসী পরিণতিতে পরিণত হচ্ছে। মোটামুটি অনুমান অনুসারে, ১৯৭১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সমুদ্রের উপরের ২৪৬ ফুট অঞ্চলের উষ্ণতা প্রায় ০.৮ ° ফারেনহাইট হারে বৃদ্ধি ঘটে। যেহেতু উষ্ণ তাপমাত্রার কারণে জলের প্রসারণ ঘটছে, তাই সমুদ্রের তাপমাত্রার এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়িয়ে দেবে (Aguado & Burt, 2014)। আগামী ৫০ বছরে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন দ্বিগুণ বিবেচনা করে, এটি অনুমান করা হয়েছে যে গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৭ ইঞ্চি বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু কিছু স্থানের এই গড়ের উপর ভিত্তি করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে, যেমন এই বৃদ্ধি ইউরোপের উপকূলে ৩৫ সেন্টিমিটার (১৪ ইঞ্চি) মতন হতে পারে (Aguado & Burt, 2014)। উপরন্তু, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ এবং বরফের আস্তরন গলার মাধ্যমে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমে অ্যান্টার্কটিকাতে বরফের চাদর ইতিমধ্যে গলতে শুরু করেছে, এবং এটিই আগামী শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কমপক্ষে ১৬ ফুট বৃদ্ধির কারণ হতে পারে (Aguado & Burt, 2014)। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা স্পষ্টতই উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে, তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির আরও পরিণতিও রয়েছে, যেমন উপকূলীয় অঞ্চল ক্ষয় এবং আরো উচ্চতর সুনামির আগমন(Lazrus, 2012)।

খরা:

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি সরাসরি খরার পুনরাবৃত্তি এবং তীব্রতার বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। খরার জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ সূচকগুলি আগত আর্দ্রতা (বৃষ্টি এবং প্রবাহ) এবং বহির্গামী আর্দ্রতা (বাষ্পীভবন এবং বাষ্পীভবন)

এর মধ্যে ভারসাম্য (বা এর অভাব) মূল্যায়ন করে (Mann & Gleick, 2015)। যে জলবায়ু পরিবর্তন বৃষ্টিপাতের অভাবের সাথে যুক্ত, উষ্ণতা তাপমাত্রা অবশ্যই বহির্গামী উপাদানকে প্রভাবিত করে। তাপের কারণে যেমন বরফ গলে যায়, তেমনি জলকে বাষ্পীভূত করে। জলের অণুগুলিতে শক্তি থাকে যা স্বাভাবিকভাবেই কম্পন সৃষ্টি করে, এবং বাষ্পীভবন ঘটে তাদের কম্পনের ফলে হাইড্রোজেন বন্ধনগুলিকে একসাথে যুক্ত করার জন্য যথেষ্ট উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পন করা হয়। যেহেতু তাপ শক্তির একটি রূপ, উচ্চ তাপমাত্রার ফলে কম্পনশীল ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হয়, তাই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাষ্পীভবনের হার বৃদ্ধি পায়। এইভাবে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বহির্গামী আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীকালে খরায় পরিণত হয়, যদি আগত আর্দ্রতার তুলনামূলক বৃদ্ধি না হয়, এবং আগত এবং বহির্গামী আর্দ্রতার মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হবে, খরার তীব্রতা তত বেশি হবে। বাষ্পীভবনের হারের পাশাপাশি খরার ফ্রিকোয়েন্সিও বৃদ্ধি পায়; আর্দ্রতার ভারসাম্য পৌঁছানোর জন্য আরও বেশি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন, তাই বৃষ্টিপাতের একটি ব্যবধান যা আগে ন্যূনতম হত, বাষ্পীভবনের হার দ্রুত হলে খরার কারণ হবে। গুরুতর খরার অনেক ক্ষতিকারক পরিণতি রয়েছে যা জলবায়ু-প্ররোচিত বাস্তুচ্যুতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে, তবে এই আলোচনাকে দুটি পরিণতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করব। প্রথমত, আর্দ্রতা উৎপাদনশীল কৃষির চাবিকাঠি, তাই খরা প্রায়শই ব্যাপক ফসল ও গবাদি পশুর ক্ষতির কারণ হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় অবদান রাখে (Simelane, 2016)। ১৯৯০ সালের একটি বিশ্লেষণে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে বিশ্বে শস্যের ফসল একবিংশ শতাব্দীতে প্রতি দশকে তিনবার ১০% হ্রাস পেতে পারে । উন্নয়নশীল দেশগুলি আরও বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, এবং ১৯৯৩ সালের একটি সমীক্ষা প্রস্তাব করে যে এই দেশগুলি ৯-১১% হ্রাস দেখতে পাবে । ২০৬০ সাল নাগাদ শস্য উৎপাদনে বিপুল হ্রাস দেখা যাবে, যা ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ৬৪০ মিলিয়ন বৃদ্ধি করতে পারে, যার ফলে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ১ বিলিয়ন এ পৌঁছে যাবে (Myers, 1993)।

ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টিপাত এবং বন্যা:

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়, ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও পুনরাবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উষ্ণ সমুদ্রের তাপমাত্রা ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি ও তীব্রতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের বিপর্যয় মানুষের বসতবাড়ি, অবকাঠামো এবং জীবিকার উৎস ধ্বংস করে দেয়, যার ফলে অনেক মানুষ বাধ্য হয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষ করে সুন্দরবন, এই ধরনের দুর্যোগের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এবং ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আমফান সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। এসব ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়, কৃষিজমি নোনা জলে প্লাবিত হয় এবং মানুষের জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (Aggarwal, 2020)। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবন অঞ্চলে জলবায়ু-প্ররোচিত অভিবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করছে।

সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা:

জলবায়ু পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথেও সম্পর্কিত। খরা, বন্যা বা অন্যান্য জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের ফলে কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস পায় এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও জীবিকার সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে সম্পদের উপর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়, যা অনেক সময় সামাজিক অস্থিরতা ও সংঘাতকে তীব্রতর করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কৃষিনির্ভর অঞ্চলে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সহিংসতার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাব-সাহারান আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে জলবায়ুজনিত খরা ও খাদ্য সংকট সংঘাত ও বাস্তুচ্যুতির সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে (*Somalia*

Refugee Crisis Explained, 2023)। একইভাবে সিরিয়ার দীর্ঘস্থায়ী খরা গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপক জনসংখ্যা স্থানান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল (Clingham-David, 2021)।

সুন্দরবন অঞ্চলের মাইগ্রেশনের কারণ:

সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের অন্যতম প্রধান কারণ হল কর্মসংস্থানের অভাব, যা অনেক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। আভিজিৎ মিস্ত্রী এবং ভাস্বতি দাসের সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় ৮৮ শতাংশ অভিবাসী কর্মসংস্থানের সন্ধানে সুন্দরবনের বাইরে চলে যায়। উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তারও এই অভিবাসনের প্রবণতাকে বৃদ্ধি করেছে এবং এর ফলে বৃত্তাকার বা মৌসুমি অভিবাসনের ধরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে (Mistri & Das, 2019)। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৃদ্ধি এই অঞ্চলে জলবায়ুজনিত অভিবাসনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে পরিবেশগত কারণে অভিবাসনের দুটি প্রধান ধরণ রয়েছে। প্রথমত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরপরই যখন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তখন মানুষ বাধ্য হয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয়ত, যখন পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবিকার উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তারা ধীরে ধীরে অন্য অঞ্চলে অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেয় (Anwer, 2012)। এই অভিবাসন অস্থায়ী, স্থায়ী অথবা অভ্যন্তরীণ হতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসন প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা কৌশল হিসেবে কাজ করে, যেখানে একটি পরিবারের অন্তত একজন সদস্য সাধারণত পুরুষ, কাজের জন্য অন্যত্র চলে যায়। ভারতীয় সুন্দরবনের বহু মানুষ কেরালা, গুজরাট, মুম্বাই এবং উড়িষ্যার মতো রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিক বা দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে অভিবাসন করে। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলার পর এই ধরনের অভিবাসনের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে পরিবেশগত পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক কারণের সমন্বিত প্রভাব সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালক হিসেবে কাজ করছে (Bose, 2014)।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে মাইগ্রেশন ঘটে বা মাইগ্রেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াই যে পুশ এবং পুল ফ্যাক্টর কাজ করে, এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে পুশ এবং পুল ফ্যাক্টর গুলি হলো নিম্নরূপ-

পুশ ফ্যাক্টর:

অর্থনৈতিক কার্যকলাপের করুণ দশা (Poor economic Activity)

যদি আমরা সুন্দরবন অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দেখি তা অনেকটা নির্ভর করে তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ছে। ভূমিক্ষয়ের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের সংকোচন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় এই অঞ্চলে সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্রবেশ করে ফলে চাষযোগ্য জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ চাষযোগ্য জমি নষ্ট হয়ে যায়। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে যে মিষ্টিজল জমা হয় সেই অল্প সময়টুকুতে তারা সামান্য কিছু শাকসবজি চাষ করতে পারে। তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চাষবাষ, মাছধরা, মধু সংগ্রহ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে অনেক কৃষকের জীবিকা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে সমুদ্রের জলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত কিন্তু মাছের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ায় তারা এই জীবিকা থেকে সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সমুদ্রে মাছ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে প্রধানত দুটি কারণ কে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে- প্রথমত জলবায়ুগত পরিবর্তনের ফলে এবং দ্বিতীয়ত, অত্যাধিক হারে মাছ ধরার ফলে মাছের উৎপাদনশীলতা কমে যায় (সিংহ, 2023)। ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হওয়ার ফলে মধু সংগ্রহ সমস্যার হয়ে পড়ে। এছাড়া জঙ্গলে বাঘের শিকার হয় বহু মৌলেরা। তাছাড়া এই অঞ্চল বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় সর্বত্র মৌলেরা যেতে পারেনা সরকারের থেকে নির্দিষ্ট অনুমোদন

নিতে হয় সেখানে সব জায়গায় না যেতে পারায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের হার খুবই নিম্ন। বেশিরভাগ মানুষ বেকার হওয়ায় তাদের মধ্যে বাইরে চলে যাওয়ার একটি প্রবণতা কাজ করে থাকে অর্থাৎ করুন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ একটি পুশ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে থাকে এই অঞ্চলে।

রোজগারের অভাব (Lack of Employment Opportunities)

সুন্দরবন অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। কৃষি, মাছধরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জীবিকা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বহু মানুষ নিয়মিত আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও গ্রামীণ মানুষের জীবিকা সুরক্ষার জন্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, যেমন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প (MGNREGA), চালু রয়েছে, তবুও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন পর্যাপ্ত নয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য থেকেও দেখা যায় যে নিয়মিত কর্মসংস্থানের অভাব এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি বড় সমস্যা। ফলে কর্মসংস্থানের এই সংকট সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুশ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় (Climate Change and Natural Disasters)

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবন অঞ্চল ক্রমশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক দশকে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও পুনরাবৃত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রা এবং জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় বাড়িঘর ধ্বংস, কৃষিজমিতে নোনা জলের প্রবেশ এবং অবকাঠামোর ক্ষতি মানুষের জীবনকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের ঘূর্ণিঝড় ফনী, ২০১৯ সালের ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এবং ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আমফান সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। বিশেষ করে আমফানের ফলে বহু কাঁচা বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং কৃষিজমি নোনা জলে প্লাবিত হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালের ঘূর্ণিঝড় ইয়াসও এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে (রুদ্র & লাহিড়ী, 2020)।

সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমানে ভূমিক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার সমস্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় ভাঙনের কারণে বহু মানুষের বসতভিটা নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক সুগত হাজরার গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য উপকূলীয় এলাকার তুলনায় বেশি। এর প্রভাব সরাসরি কৃষিজমি এবং মিষ্টি জলের উৎসের উপর পড়ছে, যার ফলে মানুষের জীবিকা ব্যবস্থা ক্রমশ ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ঘূর্ণিঝড়, ভূমিক্ষয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার মতো পরিবেশগত কারণগুলি সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের গুরুত্বপূর্ণ পুশ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে।

পুল ফ্যাক্টর:

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে অভিবাসনের ক্ষেত্রে পুল ফ্যাক্টরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মানুষকে উন্নত কর্মসংস্থান ও নিরাপদ পরিবেশের সন্ধানে অন্য অঞ্চলে যেতে আকৃষ্ট করে।

ভালো কাজের সুবিধা:

কাজের সুবিধা এই অঞ্চলের অভিবাসিদের আকর্ষিত করে। বেকারত্ব ও দরিদ্রতা থেকে বেরোনোর জন্য ভালো কাজের সন্ধানে অভিবাসিরা যেখানে সুযোগ পায় সেই অঞ্চলে অভিবাসন করে। এই অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অঞ্চলের বেশিরভাগ লোক কাজের জন্য কেরালা, গুজরাট ও কর্ণাটক রাজ্যে গমন করে। ওই অঞ্চলে মূলত তারা নির্মাণকারী শ্রমিক হিসাবে যুক্ত হয়। এছাড়া তারা দিনমজুরেরও কাজ করে। অনেক মানুষ

এই অঞ্চলের নিকটবর্তী শহর কলকাতাতেও আসে দিনমজুরের কাজে। তবে ভিন রাজ্যে তথা কেরালা, গুজরাট যাবার সামর্থ্য বা যোগাযোগ থাকলে সেখানে যেতে তারা পছন্দ করে তার কারণ মূলত সেখানে অনেক বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া যায়।

ভালো জলবায়ু বা কম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভবনা:

এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ সুন্দরবন অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ পরিবেশের সন্ধানেও অন্যত্র অভিবাসন করতে আগ্রহী হয়। ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন এবং লবণাক্ততার মতো সমস্যার কারণে এই অঞ্চলে বসবাস অনেক সময় অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। ফলে কম প্রাকৃতিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল জীবিকার সুযোগ রয়েছে এমন অঞ্চল অনেক মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এইভাবে উন্নত কর্মসংস্থান এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপদ পরিবেশ সুন্দরবন অঞ্চল থেকে অভিবাসনের গুরুত্বপূর্ণ পুল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।

সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের ধরণ:

সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৃত্তাকার বা সার্কুলার মাইগ্রেশন। বৃত্তাকার অভিবাসন বলতে এমন এক ধরনের অভিবাসনকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি তার আদি বাসস্থান ছেড়ে সাময়িকভাবে অন্যত্র কাজের জন্য যায় এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আবার নিজ অঞ্চলে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়াটি বারবার ঘটলে তাকে বৃত্তাকার অভিবাসন বলা হয়(Hugo, 2013)। সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধরনের অভিবাসন খুবই সাধারণ। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় মৌসুনি দ্বীপে দেখা যায় যে অনেক অভিবাসী বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে ফিরে আসে। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী অধিকাংশ অভিবাসী বছরে অন্তত একবার বাড়িতে আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার থেকেও বেশি বার ফিরে আসে। যারা দূরবর্তী রাজ্যে কাজ করতে যায় তাদের ফিরে আসার হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই যারা কাজ করে তারা বছরে বহুবার বাড়িতে ফিরে আসে (Mistri & Das, 2019)।

বৃত্তাকার অভিবাসনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Agunias এবং Newland অভিবাসীদের প্রস্থান ও প্রত্যাবর্তনের ধরন অনুযায়ী একটি শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, অভিবাসনের ক্ষেত্রে মানুষ কখনও স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যায়, আবার অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময় পরে নিজ অঞ্চলে ফিরে আসে (Newland et al., 2008)। এই ধারণার আলোকে দেখা যায় যে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ অভিবাসনই মূলত অস্থায়ী প্রকৃতির। অনেক শ্রমিক কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে গেলেও তারা স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করে না; বরং কিছু সময় পরে আবার নিজেদের আদি অঞ্চলে ফিরে আসে। অভিজিৎ মিস্ত্রীর গবেষণাতেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে দেখা যায় যে সুন্দরবনের অনেক শ্রমিক স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত না হয়ে সাময়িকভাবে কাজের জন্য বাইরে যায় এবং পরে আবার বাড়িতে ফিরে আসে।

সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মরশুমি বা ঋতুভিত্তিক অভিবাসন। এই অঞ্চলের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় বছরের সব সময় সমানভাবে কাজের সুযোগ থাকে না। সাধারণত বর্ষাকাল এবং কৃষিকাজের মৌসুমে মানুষ নিজ এলাকাতেই থাকে। কিন্তু কৃষি মৌসুম শেষ হলে অনেক শ্রমিক জীবিকার সন্ধানে অন্য জেলা বা রাজ্যে চলে যায়। কৃষি কাজের এই মৌসুমি চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত যে অভিবাসন ঘটে, তাকে মরশুমি অভিবাসন বলা হয় এবং সুন্দরবন অঞ্চলে এটি একটি বহুল প্রচলিত ঘটনা (Mistri & Das, 2019)।

গবেষণায় আরও দেখা যায় যে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রধানত অস্থায়ী ও ঋতুগত অভিবাসনের প্রবণতা বেশি, যদিও সীমিত পরিসরে স্থায়ী অভিবাসনের ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। সমীক্ষার তথ্য থেকে জানা যায় যে অনেক পরিবারে অন্তত একজন সদস্য নিয়মিতভাবে কাজের জন্য এলাকার বাইরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের একজন সদস্য কয়েক মাসের জন্য অন্যত্র কাজ করে পরে আবার বাড়িতে ফিরে আসে। তবে কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে অন্য অঞ্চলে কাজ করার উদাহরণও দেখা যায়, যা দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসনের ইঙ্গিত দেয় (Das et al., 2023)।

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে অভিবাসনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু গন্তব্য অঞ্চল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শ্রমিক কাজের জন্য কেরালা, গুজরাট, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে চলে যায়, যেখানে তারা প্রধানত নির্মাণ শ্রমিক বা দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলেও কাজের জন্য অভিবাসন করে। তুলনামূলকভাবে বেশি মজুরি এবং নিয়মিত কাজের সুযোগ এই গন্তব্য অঞ্চলগুলিকে অভিবাসীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

এছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ অভিবাসী স্থায়ীভাবে তাদের আদি অঞ্চল ত্যাগ করে না; বরং তারা নিয়মিতভাবে বাড়িতে ফিরে আসে এবং পরিবারের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের জমি ও সম্পত্তি ধরে রাখে এবং পরিবারের সদস্যদের কাছে অর্থ পাঠায়, যা পরিবারের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসনকে কেবল স্থানান্তর হিসেবে নয়, বরং জীবিকা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবেও দেখা যায়।

অভিবাসীদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Socio-Economic Profile of the Migrants)

সুন্দরবন অঞ্চলের অভিবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তাদের একটি বড় অংশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা মূলত কৃষি, মৎস্য আহরণ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব সরাসরি তাদের আয় ও জীবনযাত্রার উপর পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আর্থিক অবস্থাকে আরও অনিশ্চিত করে তোলে।

সামাজিক পরিচিতি:

এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষজন তপশিলি জাতি (SC) ভুক্ত। অন্যান্য অনগ্রসর জাতি (OBC) ও তপশিলি উপজাতির (ST) মানুষজনও রয়েছে। তবে সমীক্ষায় অভিবাসীদের ৬০% তপশিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের ও ৩৫% অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের এবং ৫% তপশিলি উপজাতির মানুষ। এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট যে সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসন প্রধানত সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশি দেখা যায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

অভিবাসীদের শিক্ষাগত অবস্থার দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে অধিকাংশ মানুষের শিক্ষার স্তর তুলনামূলকভাবে নিম্ন। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬০ শতাংশ অভিবাসী পঞ্চম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, প্রায় ২০ শতাংশ কেবল প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়েছে, মাত্র ৫ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে এবং প্রায় ১৫ শতাংশ সম্পূর্ণ নিরক্ষর। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং অল্প বয়সেই কাজের প্রয়োজনীয়তার কারণে এই অঞ্চলে স্কুলছুটের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি, বিশেষ করে কিশোরদের মধ্যে।

বয়সগত কাঠামো:

অভিবাসীদের বয়সগত কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ২৫ থেকে ৩৯ বছর বয়সী মানুষদের মধ্যেই অভিবাসনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬০% অভিবাসী এই বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী অভিবাসীর হার প্রায় ৩০%, এবং ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সী অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১০%। এটি নির্দেশ করে যে মূলত কর্মক্ষম বয়সের মানুষই বেশি অভিবাসন করে।

বৈবাহিক অবস্থা:

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অভিবাসীদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাদের একটি বড় অংশ বিবাহিত। সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা বিবাহিত এবং অবশিষ্ট প্রায় ১০ শতাংশ অবিবাহিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনের সময় পরিবারের সদস্যদের নিজ গ্রামেই রেখে যেতে হয়। এর ফলে পরিবার ও সন্তানদের উপর বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে, কারণ পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে অবস্থান করেন।

ঘরবাড়ির অবস্থা:

অভিবাসী পরিবারের বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে তাদের একটি বড় অংশ তুলনামূলকভাবে অনিরাপদ আবাসনে বসবাস করে। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪০ শতাংশ পরিবারের ঘরবাড়ি কাঁচা প্রকৃতির, অর্থাৎ সেগুলি ইট, বালি ও সিমেন্ট দিয়ে নির্মিত স্থায়ী কাঠামো নয়। এছাড়া প্রায় ২০ শতাংশ পরিবারের বাড়ি আংশিক পাকা হলেও সেখানে স্থায়ী কংক্রিটের ছাদ নেই; পরিবর্তে টিন বা অ্যাসবেস্টসের ছাদ ব্যবহার করা হয়। এই তথ্যগুলি সামগ্রিকভাবে নির্দেশ করে যে অধিকাংশ অভিবাসী পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব শক্তিশালী নয় এবং তাদের আবাসন পরিস্থিতিও তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

জীবিকা (Livelihood Conditions in the Sundarbans)

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবিকা মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলে প্রধানত কয়েকটি জীবিকার ধরণ দেখা যায়, যেমন কৃষিকাজ, মাছ ও কাঁকড়া ধরা, মধু সংগ্রহ এবং সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত কিছু কাজ। তবে এই সমস্ত জীবিকাই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব সরাসরি মানুষের আয় ও জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে (রুদ্র & লাহিড়ী, 2020)।

কৃষিভিত্তিক জীবিকা:

সুন্দরবনের অনেক মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষিকাজ হলেও এই অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। কৃষি মূলত বৃষ্টিনির্ভর এবং অধিকাংশ জমি একফসলি। বর্ষাকালে ধান চাষ প্রধান ফসল হলেও বছরের বাকি সময়ে পর্যাপ্ত সেচের অভাবে কৃষিকাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমুদ্রের নোনা জল প্রবেশ এবং নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে কৃষিজমি প্রায়ই লবণাক্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং উৎপাদন কমে যায়। যদিও কিছু অঞ্চলে লঙ্কা, বেগুন, টমেটো বা অন্যান্য সবজি চাষ করা হয়, তবুও পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও বিপণন ব্যবস্থার অভাবে কৃষকেরা প্রায়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফলে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না (রুদ্র & লাহিড়ী, 2020)।

মাছ ও জলজ সম্পদ নির্ভর জীবিকা:

কৃষির পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষের জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল নদী ও সমুদ্র নির্ভর মাছ ও কাঁকড়া ধরা। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদী, খাল ও খাঁড়ি মাছ, চিংড়ি এবং কাঁকড়ার প্রজননের

জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। ফলে বহু পরিবার জীবিকার জন্য মাছ ধরা বা কাঁকড়া সংগ্রহের উপর নির্ভর করে। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা বাড়ায় এই পেশায় মানুষের অংশগ্রহণও বেড়েছে। তবে অতিরিক্ত আহরণ এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আয়ের উপর প্রভাব ফেলছে (রুদ্র & লাহিড়ী, 2020)।

মধু সংগ্রহ ও বনজ সম্পদ:

সুন্দরবনের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী জীবিকা হল মধু সংগ্রহ। প্রতিবছর শীতের শেষ থেকে গ্রীষ্মের শুরু পর্যন্ত কয়েক মাস ধরে মৌমাছিরা ম্যানগ্রোভ অরণ্যে মধু সংগ্রহ করে এবং সেই সময় স্থানীয় মানুষ দলবদ্ধভাবে জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করে। তবে এই কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ মধু সংগ্রহকারীদের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে হয় যেখানে বাঘ, কুমির এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে (*The Sting of Bees and the Tyranny of Tigers*, 2025)। তবুও অনেক মানুষের কাছে এই কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌসুমি আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবিকার সংকট:

সাম্প্রতিক সময়ে সুন্দরবন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের জীবিকা ব্যবস্থায় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীভাঙন এবং ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে ক্রমশ অনিশ্চিত করে তুলছে। বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩.১৪ মিলিমিটার হারে বাড়ছে (*A Study of Climate Change-Induced Migration in the Sundarbans Mangrove Region in the Last Ten Years*, 2021)। সুন্দরবনের মতো নিম্নভূমি উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য এই প্রবণতা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। ইতিমধ্যে লোহাছড়া ও বেডফোর্ডের মতো কয়েকটি দ্বীপ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে এবং ঘোড়ামারা দ্বীপের বড় অংশ ভূমিক্ষয়ের কারণে হারিয়ে গেছে (Bera, 2013)।

এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ও এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে ২০০৯ সালের আইলা ঘূর্ণিঝড়ের সময় বহু স্থানে বাঁধ ভেঙে সমুদ্রের নোনা জল কৃষিজমিতে প্রবেশ করে। এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ এবং অন্যান্য জীবিকার উপর এর প্রভাব পড়ায় বহু মানুষ বিকল্প আয়ের সন্ধানে অন্য অঞ্চলে যেতে বাধ্য হয় (Subhani & Ahmad, 2019)। পরবর্তী সময়ে ফণী, বুলবুল এবং আম্ফানের মতো ঘূর্ণিঝড়ও একইভাবে এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (Sengupta, 2020)।

এই পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবিকা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পরিবেশগত পরিবর্তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জীবিকার স্থিতিশীলতাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ফলে অনেক মানুষের কাছে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা কৌশল হিসেবে সামনে আসছে।

অভিবাসনের গন্তব্যস্থান (Destination of Migration)

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে অভিবাসনের ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অনেক শ্রমিক কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে চলে যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় মৌসুনি দ্বীপের বালিয়াড়ি গ্রামে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে ভিনরাজ্যে শ্রম অভিবাসনের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অভিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ কেরালায় গিয়ে মূলত নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেন। তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক শ্রমিক, প্রায় ৫ শতাংশের মতো, কেরালার বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় কর্মচারী হিসেবেও কাজ করছেন।

অন্যদিকে কিছু শ্রমিক গুজরাট রাজ্যেও কাজের জন্য অভিবাসন করেন। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ অভিবাসী সেখানে গিয়ে নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। এছাড়া প্রায় ১০ শতাংশ শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় ধান ও চালের মিলগুলিতে কাজ করেন। বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল হওয়ায় ধান কাটার মৌসুমে এবং চালকলগুলিতে অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই কারণেই সুন্দরবনের কিছু মানুষ ওই অঞ্চলে মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যায়।

এই তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে তুলনামূলকভাবে বেশি আয়ের সুযোগ এবং নিয়মিত কাজের সম্ভাবনার কারণে সুন্দরবন অঞ্চলের বহু মানুষ কেরালা ও গুজরাটের মতো রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যায়। তবে এর পাশাপাশি কিছু মানুষ নিকটবর্তী জেলাগুলিতেও মৌসুমি ভিত্তিতে কাজের জন্য অভিবাসন করে থাকে।

উপসংহার:

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবন অঞ্চলের মৌসুনি দ্বীপে জলবায়ু পরিবর্তন, জীবিকার অনিশ্চয়তা এবং অভিবাসনের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা প্রধানত কৃষি, মৎস্য আহরণ এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল, যা প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় স্থানীয় জীবিকা ব্যবস্থাকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলছে। এর ফলে বহু মানুষ বিকল্প আয়ের সন্ধানে অভিবাসনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী অভিবাসীদের একটি বড় অংশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ অভিবাসী কর্মক্ষম বয়সের মানুষ এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাও তুলনামূলকভাবে সীমিত। অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রধান গন্তব্যস্থল হিসেবে কেরালা এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যেখানে তারা মূলত নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।

অতএব বলা যায় যে সুন্দরবন অঞ্চলে অভিবাসন কেবল অর্থনৈতিক কারণের ফল নয়; বরং এটি পরিবেশগত পরিবর্তন এবং জীবিকার অনিশ্চয়তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ফলে এই অঞ্চলে টেকসই জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি, কৃষি ও মৎস্য খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

References:

1. *2022 Global Report on Internal Displacement*. (2022). http://internal-displacement.org/global-report/grid2022/
2. *A study of Climate Change-Induced migration in the Sundarbans Mangrove region in the last ten years*. (2021, June 13). Confluence: Journal of Interdisciplinary Studies. https://cjids.in/volume-v-2021/a-study-of-climate-change-induced-migration-in-the-sundarbans-mangrove-region-in-the-last-ten-years/a-study-of-climate-change-induced-migration-in-the-sundarbans-mangrove-region-in-the-last-ten-years/
3. Aggarwal, M. (2020, May 25). *Cyclone Amphan puts focus back on millions displaced by climate disasters*. Mongabay-India. https://india.mongabay.com/2020/05/analysis-cyclone-amphan-puts-focus-back-on-millions-displaced-by-climate-disasters/
4. Aguado, E., & Burt, J. E. (2014). *Understanding weather and climate* (7th ed.). Pearson Education. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/understanding-weather-and-climate/P200000006901/9780321987303?srsltid=AfmBOoqAG0e6meTuvahLniBfuUNCwGkXtHQHb6udGT98irwiIhBAo06b
5. Anwer, S. (2012). *Climate refugees in Bangladesh* (T. Göbel, J. Jenrich, C. Lottje, & S. Wirsching, Eds.). https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/analyse_30_englisch_climate_refugees_in_Bangladesh.pdf
6. Bera, M. K. (2013). ENVIRONMENTAL REFUGEE: A STUDY OF INVOLUNTARY MIGRANTS OF SUNDARBAN ISLANDS. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.979.9810
7. Bose, S. (2014, June 25). *Illegal migration in the Indian Sunderbans*. Forced Migration Review. https://www.fmreview.org/crisis/bose/
8. Clingham-David, J. (2021, August 3). *How climate change contributes to political instability*. One Green Planet. https://www.onegreenplanet.org/environment/how-climate-change-contributes-to-political-instability/
9. Das, S., Gupta, G., & Hazra, S. (2023). *Shifting lands, moving people: Livelihood, Migration, Climate Change, and Natural Disasters in the Indian Sundarbans*.
10. Garg, R., Zade, D., WOTR, Basu, J., Joshi, H., Vashist, S., Das, R., Shandilya, N., Bihar, & Patnaik, S. (2021). *CLIMATE-INDUCED DISPLACEMENT AND MIGRATION IN INDIA* (S. Yashwant & J. Faleiro, Eds.).
11. Guha, I. & Chandan Roy. (2016). Climate Change, Migration and Food Security: Evidence from Indian Sundarbans. In *International Journal of Theoretical & Applied Sciences* (Vols. 8–2, pp. 45–49) [Journal-article]. Research Trend. https://www.researchtrend.net/ijtas/pdf/9%20DR.%20INDRILA%20GUHA%201033%20Climate%20Change,%20Migration%20and%20%20Food%20Security%20Evidence%20from%20Indian%20Sundarbans.pdf
12. Hugo, G. (2013). What we know about circular migration and enhanced mobility. In *https://www.migrationpolicy.org*. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/research/what-we-know-about-circular-migration-and-enhanced-mobility
13. International Organization for Migration. (2008). Migration and Climate Change (Migration Research Series No. 31). In *https://publications.iom.int/books/mrs-no-31-migration-and-climate-change*. https://publications.iom.int/books/mrs-no-31-migration-and-climate-change

14. Lazrus, H. (2012). Sea change: island communities and climate change. *Annual Review of Anthropology*, *41*(1), 285–301. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092611-145730
15. Mann, M. E., & Gleick, P. H. (2015). Climate change and California drought in the 21st century. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *112*(13), 3858–3859. https://doi.org/10.1073/pnas.1503667112
16. Mistri, A., & Das, B. (2019). *Environmental change, livelihood issues and migration*. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8735-7
17. Myers, N. (1993). Environmental refugees in a globally warmed world. *BioScience*, *43*(11), 752–761. https://doi.org/10.2307/1312319
18. Newland, K., Agunias, D. R., & Terrazas, A. (2008). Learning by Doing: Experiences of Circular Migration. In *https://www.migrationpolicy.org*. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Insight-IGC-Sept08.pdf
19. SEN, P., & BASU RAY CHAUDHURY, A. (2023). *জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ু অভিবাসনে ইন্ধন জোগাচ্ছে*. orfonline.org. https://www.orfonline.org/bangla/expert-speak/-climate-change-fueling-climate-migration
20. Sengupta, M. (2020). *A Triple Crisis in the Indian Sundarbans*. https://environmentalmigration.iom.int. https://environmentalmigration.iom.int/blogs/triple-crisis-indian-sundarbans
21. Simelane, T. (2016). *Natural and Human-Induced Hazards and Disasters in Africa* (G. Mulugeta, Ed.). Africa Institute of South Africa. https://emu.tind.io/record/537926?ln=en
22. *Somalia refugee crisis explained*. (2023). https://www.unrefugees.org. https://www.unrefugees.org/news/somalia-refugee-crisis-explained/#:~:text=The%20Somali%20refugee%20crisis%20is,broke%20out%20in%20the%201990s.&text=and%20vulnerable%20people
23. Subhani, R., & Ahmad, M. M. (2019). Socio-Economic impacts of Cyclone Aila on migrant and Non-Migrant households in the southwestern coastal areas of Bangladesh. *Geosciences*, *9*(11), 482. https://doi.org/10.3390/geosciences9110482
24. *The sting of bees and the tyranny of tigers*. (2025, January 27). PARI - People's Archive of Rural India. https://ruralindiaonline.org/en/articles/the-sting-of-bees-and-the-tyranny-of-tigers/
25. রুদ্র, কল্যাণ & লাহিড়ী। জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ। (2020) । ভারতীয় সুন্দরবন একটি ভৌগোলিক রূপরেখা (প্রথম সংস্করণ)। আনন্দ পাবলিশার্স।
26. সরকার, অমিত কান্তি। (2022) । মাইগ্রেশন এক নিরন্তর যাত্রা (প্রথম সংস্করণ)। নাগরিক মঞ্চ।
27. সিংহ, অনিমেষ। (2023)। *সুন্দরবন ও নদীকথা* (তৃতীয় সংস্করণ). প্যারালাল প্রেস।